জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৭ ডিসেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ তাআউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়তের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরিফে বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

অনুবাদ: মু'মিনরা আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। (সূরা আল্ বাকারা, ১৬৬)। এটাও আল্লাহ্রই ভালবাসা যা ধাপে ধাপে আল্লাহ্র প্রিয়জনদের প্রতি ভালবাসায় রুপ নেয়। এবং এরা আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের চেষ্টা করে। তারা চেষ্টা করে কিভাবে তারা প্রিয়জনের ভালবাসা লাভ করবে।

হাদীসে আছে, যেদিন আল্লাহ্র রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের ছায়ার মধ্যে নিবেন। তাদের মধ্যে ঐ দুজনও থাকবে যারা আল্লাহ্র খাতিরে পরস্পর একে অপরকে ভালবাসেন। (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, হাদীস নং ৬৬০)

আল্লাহ্র খাতিরে তাদের এই ভালবাসা আল্লাহ্র সাথে তাদের সবচেয়ে বেশী ভালবাসারই বহি:প্রকাশ। অতএব, সাধারন মু'মিনা যারা একে অপরকে আল্লাহ্র খাতিরে ভালবাসেন তাদেরকেই যদি আল্লাহ্ এতবেশী প্রতিদান দেন, তবে আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রাসূলকে যারা ভালবাসে তাদেরকে আল্লাহ্ কতই না বেশী প্রতিদান দিবেন! তা অনুমানও করা যায় না। প্রেম ভালবাসার এ এক অপূর্ব দৃশ্য! যার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বা। কত ভাগ্যবান ঐ সব মানুষ যারা নিজেদের প্রেম ভালবাসার ও বিশ্বস্ততার নমুনা দেখাবার জন্য আল্লাহ্র নবী বা প্রেরিতদের যুগ পেয়ে থাকেন। আমাদের কারো কারো বাপ-দাদারা পূর্ব পুরুষরা এমন নমুনা দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগ পেয়েছেন। তারা সরাসরি হযরত (আ.) এর সাথে প্রেম-ভালবাসা; সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন। এবং তারা হযরত (আ.) এর ভালবাসাও লাভ করেছেন। আজ এমনই কয়েকজন ভাগ্যবান বুযূর্গগণের রেওয়ায়াত ও ঘটনাবলী উল্লেখ করতে চাই। কত ভাগ্যবান ছিলেন তারা, হযরত (আ.) এর হাতগুলো ছুঁয়েছিলেন, সরাসরি হযরত (আ.) এর থেকে বরকত লাভ করেছিলেন।

আমি যেসব রেওয়ায়াত বর্ণনার জন্য এনেছি তার মধ্যে প্রথম রেওয়ায়াত হযরত ওলীদাদ খান (রা:), যিনি বংশে রাজপুত ছিলেন। তার পিতার নাম লাল খান, গ্রাম মরাড়া তহসীল নারোয়াল জেলা শিয়ালকোট।

তিনি বলেছেন, আমি ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে জলসা সালানার সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছিলাম। জলসার একদিন পূর্বে কাদিয়ান পৌঁছে গিয়েছিলাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সকালে বাসভবনের বাইরে আসবেন, এজন্য মসজিদ মোবারকের বাইরে অনেক মানুষের ভীড় দেখলাম। সবাই ভীড় করছে একে অন্যের উপর হুমড়ি খাচ্ছে। আমি নবাগত ছিলাম– অন্য এক গলির মুখে দাঁড়িয়েছিলাম।

দোয়া করতে থাকলাম যেন, হুযূর এ দিকে আসেন আর আমি প্রথমে হুযূরের সাথে করমর্দন করতে পারি। তখনই দেখলাম, হুযূর (আ.) হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদসহ ঐ পথেই আসছেন। আমার মনে হল, মেঘের ভেতর থেকে যেন হঠাৎ সূর্য বেরিয়ে এল, চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমি ছুটে গিয়ে হুযূরের হাত ধরে মুসাফা (করমর্দন)-এর সুযোগ নিলাম। হুযূর (আ.) আরিয়াদের বাজারের রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

আমার মনে পড়ে হুযূর (আ.) নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের বাগানের উত্তর পাশ দিয়ে ঘুরে ফেরত আসলেন। সম্ভবত; মসজিদ নূর অথবা মাদ্রাসা আহমদীয়ার পশ্চিম সীমানায় হুযূর বসলেন। সাহাবা কেরাম আশেপাশে জড়ো হয়ে বসলেন। মীর হামেদ আলী মরহুম শিয়ালকোটী স্ব-রচিত নযম পড়ে শোনালেন।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ৮৪)

তারপর হযরত মদদ খান সাহেব (রা.) ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল কাদিয়ান, পিতা রাজা ফতেহ মোহাম্মদ খান ইয়াড়িপুরা কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। হযরত মদদ খান সাহেব ১৮৯৬ সনে পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেছিলেন এবং ১৯০৪ সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, একবার রমযানে মনে আগ্রহ সৃষ্টি হল যে, কাদিয়ানে গিয়ে রোযা রাখব এবং ঈদও সেখানেই করব। তারপর চাকুরীস্থলে গিয়ে হাজির হব। সে সময় আমি সেনাবাহিনীতে জামাদার পদে নতুন নতুন ভর্তি হয়েছিলাম মাত্র। [হুযূর (আই.) বলেন, সম্ভবত আজকাল এই পদ নাই। তবে এটি জুনিয়র কমিশন অফিসারের পদ ছিল বলে আমার ধারনা।]

আমার ইচ্ছা হয়েছিল, আমি চাকুরী আরম্ভ করার পূর্বে কাদিয়ান হয়ে হযরত আকদাস (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করবো এবং পুণরায় হুযূর (আ.) এর হাতে বয়আতের সুযোগ নিব। কারণ ইতিপূর্বে ১৮৯৫/৯৬ সালে পত্র যোগে বয়আত করেছিলাম। অতএব, এটা আমার প্রথমবার কাদিয়ান যাত্রা ছিল। আমার মনে আবেগ ছিল, অবশ্যই হুযূর (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করবো। কারণ চাকুরীতে যোগ দেয়ার পর সাক্ষাতের সুযোগ হয় কি না হয়।

সুতরাং আমি কাদিয়ান গিয়ে হযরত (আ.) এর সাক্ষাতের পর ফেরত এসে তারপর চাকুরীতে যোগ দেয়ার উদ্দ্যোগ নিলাম। কাদিয়ান এসেছিলাম ঐ রকম চিন্তা করে। কিন্তু কাদিয়ানে এসে যখন হযরত (আ.) এর পবিত্র চেহারা দেখলাম সাথে সাথে আমার অন্তরের অবস্থা এমন হোল যে, আমি মনে করলাম, আমাকে যদি পুরো কাশ্মির রাজ্য দিয়ে দেয়া হয় তবুও আমি হুযূর (আ.) কে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। হযরত (আ.) এর আকর্ষন এতো শক্তিশালী ছিল যে, আমি কাদিয়ান ছেড়ে যাবার মনোবল হারিয়ে ফেলছিলাম। হযরত (আ.) এর আকর্ষন আমাকে কাদিয়ান না ছেড়ে যেতে বাধ্য করলো। হযরত (আ.) কে দেখার পর আমার মনে হলো, কাদিয়ান ছেড়ে গিয়ে যদি আমার বেতন হাজার টাকাও হয় তো কী হবে? কিন্তু কাদিয়ান ছেড়ে গেলেতো হুযূরের পবিত্র চেহারা দেখতে পাব না! শেষে, কাদিয়ান ছেড়ে দেশে যাওয়ার ইচ্ছা আমি পরিত্যাগ করলাম। আমার মনে হলো কাদিয়ানে আমি মারা গেলে তো হুযূর আমার জানাযা পড়াবেন এবং এতে করে আমি পার পেয়ে যাব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবো।

কাদিয়ানে অবস্থান করার ইচ্ছা দৃঢ় করার পর প্রতিদিন আমি দোয়ার জন্য হুযূর (আ.) এর কাছে লিখতে শুরু করলাম। দোয়ার জন্য পত্র লিখে, খামে ভরে প্রতিদিন হুযূরের দরজায় যেতাম। কারো হাতে ভেতরে পাঠাতাম। অন্তরে ভয়ও হতে লাগল। হুযূর (আ.) বিরক্ত হন কিনা তা তো জানি না। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। একদিন হুযূর (আ.) এর লেখা পত্র পেলাম। হুযুর লিখেছেন, তুমি এটি ভাল পথ অবলম্বন করেছো। আমাকে দোয়ার জন্য স্মরণ করাতে থাকো। আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবো। আল্লাহ তোমাকে সাংসারিক ও ধর্মীয় জীবনে সাফল্য দিবেন। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। খোদা তাআলা নিজেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিবেন। আমাকে স্মরণ করাতে থাকো।

আমি তোমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তিনি (আ.) আরো লিখেছেন, হযরত আকদাস (আ.) এর পত্র পেয়ে আমি শেখ গোলাম আহমদ সাহেব নও-মুসলিমকে দেখালাম যে, আজ হুযূর (আ.) এর পত্রখানা পেয়েছি। বললাম, আমিতো হুযূর (আ.) কে কখনও আমার বিয়ে সর্ম্পকে ইশারাও করি নি। শেখ সাহেব হেঁসে বললেন, এখনতো তোমার বিয়ে শিঘ্রই হয়ে যাবে। কারণ হুযূর (আ.) এর কথা কখনো বিফল হয় না। নিজেকে প্রস্তুত করুন।

লিখেছেন, দু মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল। পূর্বে আর কোথাও আমার বিয়ে হয়নি। আমার দুটি বিয়ে হুযূর (আ.) নিজেই করিয়েছিলেন। নয়তো আমার মত বহিরাগতকে কে বিয়ে দিত! হুযূর (আ.) এর পক্ষ থেকে এটি আমার জন্য সবিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একান্তই দয়াপরবশ হয়ে হুযূর (আ.) আমার বিয়েগুলো করিয়েছিলেন। কতই না তুচ্ছ আমি আর আমার সাথে এ কেমন ব্যবহার!

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ৯৫-৯৭)

হযরত মাষ্টার মোহাম্মদ পিরেল সাহেব, কামালডেরা, সিন্ধু লিখেছেন,

"আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দ; বিনীত এ বান্দা আল্লাহর ফযলে জুলাই ১৯০৫ সালে হযরত জারিউল্লাহ ফী হোলালিল আম্বিয়া (আ.) এর হাতে বয়আত গ্রহন করেছিলাম।

সে যুগে মসজিদ মোবারক খুব ছোট ছিল, চার পাঁচ ব্যক্তি বসলেই জায়গা ভরে যেত। সে সময় জুলাই মাসে খুব গরম পড়েছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন মসজিদে বসতেন, আমি হুযূরের নিকটে বসে পাখা চালাতাম। মসজিদের উপরে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের দফতর ছিল। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব একদিন হুযূর কে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। তিনি হুযূর (আ.) এর নিকটে বসে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা করছিলেন যেন আমি সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেই।

আমি যেতে উদ্দ্যত হলাম। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাকে বললেন, 'সরবে না'। যেমন বসে আছো বসে থাক। আমি সরে না গিয়ে পাখা হাকাতে থাকলাম। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুযূরের সাথে কথা বললেন। হুযুর জবাব দিলেন। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখে নিয়ে চলে গেলেন। ঐ যুগে তো এ বিষয়ে কিছু মনে হয় নি। এখন মনে হলে বড় আনন্দ বোধ করি। কারণ আমি অতি সাধারন মানুষ, উর্দূও ভাল বুঝি না। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ পাশ শিক্ষিত, বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর নবীর দৃষ্টিতে ছোট বড় সবাই সমান ছিল। এ অধম প্রায় ১৫ দিন কাদিয়ানে অবস্থান করেছিলাম। প্রতিদিন হযরত (আ.) এর নূরানী চেহারা দেখতাম। আমার মনে হতো হুযূর (আ.) এই মাত্র গোসল করে এসেছেন। মাথার চুল ঘাড়ের উপর এসে থাকতো। মনে হতো যেমন চুল থেকে ফোটা ফোটা মতি ঝরছে। হযরত (আ.) সর্বদা

হাসিখুশি থাকতেন। কখনও দু:খ ভারাক্রান্ত মনে হতো না।

হযরত চৌধুরী আব্দুল হাকীম পিতা চৌধুরী শরফুদ্দীন সাহেব জেলা গুজরাঁ ওয়ালা লিখেছেন, ১৯০২ সনের গরম কালের কথা। আমি তখন মুলতান সেনানিবাস রেল ষ্টেশনে সিগনাল ম্যান হিসাবে চাকরী করতাম। আহলে হাদীস মত পোষন করতাম। মৌলভী আব্দুল জব্বার ও আব্দুল গাফ্‌ফার দুই ভাই ছিলেন। মুলতান শহরের দূর্গের পাশে বইয়ের দোকান ছিল। আমি তাদের থেকে কুরআনের অনুবাদ পড়তাম। একদিন ঘটনাক্রমে মৌলভী বদর উদ্দীন আহমদীর সাথে দেখা হয়ে গেল, যিনি একটি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তিনি আমাকে আল হাকাম পত্রিকা পড়তে দিলেন। ঐ পত্রিকার প্রথম পাতায় লেখা ছিল। 'আল্লাহ্ তাআলার তাজা ঐশী বাণী ও যুগ ইমামের পবিত্র বাণী' এগুলোকে পড়ে আমার অন্তরে এমন প্রেম ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেল যেমন এখনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খেদমতে হাজির হই।

আল্লাহ্‌র ফযলে আহলে হাদীস মৌলভীদের বিরোধীতা সত্বেও আমি শিঘ্রই আহমদী হয়ে গেলাম। মৌলভী বদরউদ্দীন সাহেব আমাকে কাদীয়ান যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমার সাথে যাবার জন্য একজন আহলে হাদীসের মৌলভী সাহেবও আমার সাথে প্রস্তুত হোল। আহলে হাদীসের সে মৌলভী সুলতান মাহমুদ সাহেবের খাস শিষ্য। আমরা খুব গরীব মানুষ ছিলাম। আমার বেতন-পনের টাকা নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। রেলের কোন পাশ পাওয়ার অধিকার ছিল না।

অমৃতসরের টিকেট কিনে গাড়ীতে বসে গেলাম। অমৃতসর পৌঁছে আমাদের টিকেট শেষ হোল। বাটালা পর্যন্ত টিকেটের টাকা ছিল না। মাত্র আট আনা ছিল হাতে। দুই-দুই আনার টিকেট নিয়ে গাড়ীতে বসে গেলাম। সারাক্ষণ ভয় হচ্ছিল টিকেট চেকার জিজ্ঞাসা করলে অপমানিত হতে হবে। টিকেট চেকার আসলেন, আমাদের টিকেট চেক করলেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। টিকেট ভাল করে দেখে টিকেট আমাদের ফেরত দিয়ে চলে গেলেন। বাটালা এসে নেমে স্টেশনের বাইরে যাবার গেটেও টিকেট চেক হোল এখানেও আমাদের টিকেট দেখে আমাদেরকে কিছু বলল না। আমরা দোয়া করে যাচ্ছিলাম। প্রথম অলৌকিক সাহায্য এটা দেখলাম, আমাদের অপমানিত হতে হয় নি। আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল। অবশেষে বাটালা থেকে হেঁটে কাদিয়ান পৌঁছে গেলাম। আমরা যখন মসজিদে মোবারক পৌঁছলাম তখন হযরত (আ.) আসলেন। হযরত (আ:) দেখেই আমার সাথী আহলে হাদীসের মৌলভী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কুরআন-হাদীস আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য তো আছেই তাহলে বয়আতের কি প্রয়োজন? হযরত সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি আমার সাথী বললেন, আমার আর কোন প্রশ্ন নাই আমি বয়আত করতে চাই। হযরত বললেন, আরো অপেক্ষা করুন, পুরোপুরি নিশ্চিত হোন; ধোকা যেন না খান। নামায যোহর পড়ে হযরত ভেতরে চলে গেলেন। হযরতের বক্তৃতা শেষে হযরত মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটী সাহেব বললেন, আমাদের কাগজ গুলোতে এসব কথা লেখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্ন করার তো কোন প্রয়োজন ছিল না যে কুরআন হাদীসের উপস্থিতিতে বয়আতের কি প্রয়োজন? মৌলভী সাহেব বললেন বাহির থেকে এসে লোকেরা এভাবে প্রশ্ন করে হযরত সাহেবকে কষ্ট দেয়, পত্রিকা পড়ে না। হযরত সাহেব বললেন, মৌলভী সাহেব! বক্তৃতা করি আমি আর কষ্ট হয় আপনার! হযরত সাহেব যে কোন লোকের প্রশ্নের উত্তর খুব সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করতেন। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১২১-১২৪)

গুজরাঁ ওয়ালা জেলার হযরত চৌধুরী আব্দুল হাকিম পিতা চৌধুরী শরফ উদ্দীন সাহেব লিখেছেন, যেদিন সন্ধ্যায় আমি হযরতের (আ.) হাতে বয়আত করেছিলাম, হযরতের ভিতর চলে যাবার পর আমি মৌলভী নূরুদ্দীন এর কাছে গেলাম, তিনি মসজিদেরই একটি কামরায় থাকতেন। মৌলভী সাহেব একটি ছোট্ট চারপাই ছাদের উপর লাগিয়ে রেখেছিলেন। তার কাছে অনেকক্ষন থেকেছিলাম। অনেক কথা তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম। একটি কথা ছাড়া কোন কথা আমার স্মরণ নাই। মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব বলেছিলেন, লোকেরা বলে যে নূরুদ্দীন নাকি জাগতিক উপার্জনের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। এখানে তো ঐ চারপাই খানা পেয়েছি যার উপর আমার শরীরের অর্ধেক মাত্র সঙ্কুলান হয়। আমি তো কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে এসেছি। হযরতের বয়আত করে সেটা আমি পেয়ে গেছি। যে খোদাকে পাওয়ার জন্য এসেছিলাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে তা আমি পেয়ে গেছি।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১২৫)

এটাই সেই সম্মান যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার এক পংক্তিতে উল্লেখ করেছেন।

چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نور دیں بودے
ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقیں بودے

"কতই না খুশীর কথা যদি এ উম্মতের প্রত্যেকে নূরুদ্দীন হোত। এটা তখনই হতে পারে যখন প্রত্যেকের হৃদয় দৃঢ় ঈমানের নূরে পরিপূর্ণ হবে।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর দাবীর প্রতি যদি পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তাহলে হযরত নূরউদ্দীন (রা.) এর মত মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে।

হযরত হামেদ হোসেন খান সাহেব পিতা মোহাম্মদ হোসেন খান মুরাদাবাদ লিখেছেন, "আমি ১৯০২ সনে আলীগড় থেকে মীরাঠে এসে চাকুরী শুরু করেছিলাম।

এখানে আমার চাকুরী লাভের কিছুকাল পরে মুকাররাম খান সাহেব যুলফিকার আলী খান সাহেবও মীরাঠে বদলি হয়ে এলেন পানি সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টর হয়ে। তিনি আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তার বাসভবনে ধর্মীয় আলোচনার আসর বসতো।

শেখ আব্দুর রহিম খান সাহেব, রংসাজ সদর বাজার মীরাঠ ক্যাম্প, মৌলভী আব্দুর রহিম প্রমুখগণ খান সাহেবের বাস ভবনে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। খান সাহেবের সাথে আমারও আলীগড়ের শিক্ষা লাভের কারণে আন্তরিক ভালবাসার সর্ম্পক ছিল, তাই আমারও আসা যাওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। আমি বই পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করাতে

খান সাহেব আমাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছোট ছোট বইগুলো পড়তে দিতে থাকেন। সম্ভবত; বারকাতুদ দোয়া সর্বপ্রথম পড়ার সুযোগ হলো আমার । অন্যান্য বইও ছিল। আমি পড়তে আরম্ভ করলাম।

একবার মৌলবী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব খান সাহেবের বাসায় এসেছিলেন। মীরাঠে মুনাজেরা (ধর্মীয় বিতর্ক সভা)-এর জন্য এসেছিলেন। সে সময় আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু। দুষ্ট লোকদের কারণে মীরাঠে কোন তর্ক-সভা হোল না। তবে মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেবের বক্তৃতা আমি শুনেছিলাম। মীরাঠের লোকদের সাথে ধর্মীয় তর্ক-সভা নিয়ে যে ঝগড়া হয়েছিল, শুনেছি পৃথক আকারে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

এ ঘটনার পর আমার মনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হল। আমি খান সাহেবকে বললাম, হযরত সাহেব যদি মীরাঠের আশে পাশে কোথাও আসেন তাহলে আমাকে জানাবেন। এমন একজন মহান ব্যক্তিকে আমি দেখতে চাই। যদি না দেখতে পারি তাহলে এটা আমার দুর্ভাগ্য হবে। তখন বয়আত করার কথা আমার মনে হয় নি।

তারপর ১৯০৪ ইং সালে বড় বিধ্বংসী এক ভূমিকম্প হয়ে গেল। বলা হলো যে, হযরত সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এ ভূমিকম্প হয়েছে। তারপর একদিন খান সাহেব বললেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিল্লী আসবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাক্ষাতের জন্য আপনিও চলুন। আমিও আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং আমরা দিল্লী চলে আসলাম।

দিল্লীতে হযরত আকদাস (আ.) চান্দলি কবর মহল্লার আলিফ খার হাভেলীতে অবস্থান করলেন। আমি এবং খান সাহেব যুলফিকার আলী খান রেল যোগে দিল্লী গেলাম। তখন প্রায় দুপুর ১২টা বা ১টা হবে। হযরত সাহেব তার গৃহের উপর তলায় অবস্থান করছিলেন। নিচের তলায় অন্যান্যরা। বাড়ীতে প্রবেশ করে আমার দৃষ্টি প্রথমে হযরত মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেবের উপর পড়ল। কারণ তাকে আমি জানতাম। আমি তার কাছে বসে কথা বলছিলাম। কিছুক্ষন পরে খান সাহেব যিনি বারান্দায় বসা ছিলেন আমাকে তার কাছে ডাকলেন। উপরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অবস্থান করছিলেন। আমি একটি চারপাইয়ের পইথানের দিকে বসলাম। কথা বলছিলাম।

আমি যেখানে বসে ছিলাম সাথেই উপরে যাবার সিড়ি ছিল। এমন সময় হযরত (আ.) ঐ সিড়ি বেয়ে উপর থেকে নিচে নেমে আসলেন। সেদিকে আমার পিঠ ছিল। অতএব আমি তাঁকে দেখিনি।

হযরত সাহেব আস্তে-আস্তে এসে আমার সামনের চারপাইয়ের উপর বসলেন। কোন শব্দ ছিল না। সে সময় হযরত সাহেবকে চিনে এমন কেউ সেখানে ছিল না। আমিও চিনতাম না। কেউ আমাকে ডাকছিলেন যে, হুযূর এসেছেন। আমি কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠতে চাইলাম। কিন্তু হযরত সাহেব ইশারা করলেন, যেন এখানেই আমি বসে থাকি। হুযূর খুব অনাড়ম্বর সহজ সরল ছিলেন। আমার স্মরণ নাই যে, হুযূর আমাকে ইশারা করছিলেন অথবা আমার বাহু ধরে বসিয়েছিলেন।

হযরত সাহেবের আসার পর যারা সেখানে ছিলেন সবাই খবর পেয়ে গেলেন যে হুযূর এখানে এসেছেন। বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠল। আমার মনে পড়ে, খান সাহেব হুযূরকে জানালেন আমার সর্ম্পকে যে, আমরা মীরাঠ থেকে এসেছি। বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তা হতে থাকল। কিছু সময় পরই যোহর ও আসরের নামায আদায় করা হল। নামায শেষে হযরত (আ.) বললেন, যারা বয়আত করতে চান তারা এগিয়ে আসুন। তারপর একজন ব্যক্তি এ কথাটি জোরে জোরে বললেন। তারপর অনেকেই সামনে এগিয়ে গেলেন– আমি সবার পিছনে রইলাম। বয়আত আরম্ভের পূর্বে হযরত সাহেব বললেন, যারা আমার কাছে আসতে পারছেন না তারা তাদের সামনের যিনি বয়আত করছেন তার পিঠে হাত রেখে বয়আতের কথাগুলো উচ্চারণ করুন। তবুও আমি পেছনে চুপ করে বসে থাকলাম। কারণ বয়আতের ইচ্ছা ছিল না, তাই হাত কারো পিঠে রাখলাম না। যখন হযরত সাহেব বয়আত আরম্ভ করলেন তখন আমার হাত আমার ইচ্ছা ছাড়া আপনা থেকেই উঠে গেল এবং সামনের যিনি ছিলেন তার পিঠে হাত রাখলাম। আমিও বয়আতের কথাগুলো বলতে লাগলাম। অথচ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত উঠে গিয়েছিল। যখন হুযূর (আ.) বললেন, রাব্বি ইন্নি যালামতু নাফসি ওয়া তারাফতু বিযানবি ফাগফিরলি যুনুবি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা" সবাই তা বললেন। আমিও তাদের সাথে তা বললাম। তারপর যখন হুযূর (আ.) উর্দ্দূতে এর অনুবাদ বললেন তখনও হুযূর বললেন যে, তোমরাও উচ্চারণ কর। আমিও উচ্চারন করলাম। কিন্তু নিজের গুনাহর কথা ভেবে আমি ভয়ে কাঁদতে লাগলাম। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

আমি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। আমি জানলাম না যে, কী হচ্ছে! কিছু সময় পার হলে হুযূর বললেন পানি আন। পানি আনা হলে হুযূর পানিতে কিছু পাঠ করে দেবার পর আমার উপর ছিটালেন। এ সব কথা পরবর্তিতে খান সাহেব আমাকে বলেছিলেন।

হ্যাঁ, আমার স্মরণ আছে যে, আমি অজ্ঞান অবস্থায় দেখলাম বিভিন্ন রঙের নূরের খুঁটি আকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর কেউ আমাকে মেঝে থেকে তুলে বসালেন। আমি উঠে বসলাম। কিন্তু আমার অশ্রু ঝরা থামছিল না। পরিস্থিতি এতটাই পালটে গেল যে, আমি মিরাঠে এসেও বারবার কাঁদতে থাকলাম। উল্লেখিত খাঁন সাহেব আমার নামে 'বদর' ও 'রিভিও' পাঠাতে শুরু করলেন। 'বদর'-এ হযরত আকদাসের পবিত্র ওহী প্রকাশিত হতো। এর সাথে খুব ভালবাসা সৃষ্টি হল।

সর্বদা মনে হতো, তাজা ওহী সম্পর্কে আমি যেন সর্বাগ্রে জানতে পারি। পরবর্তীতে দারুল আমানে জলসায় যেতে লাগলাম এবং প্রতি বারই যেতাম। হুযুর আকদাসের কাছে দোয়ার আবেদন করে চিঠি লিখতাম। একটি চিঠির উত্তর তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পবিত্র হাতে লিখেছিলেন। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও সেই চিঠিটি আমার কাছে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেটি হারিয়ে গিয়েছে।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩ পৃ; ৬৩-৬৭)

হযরত মিস্ত্রী আল্লাহ্ দিত্তা (রা.), তাঁর পিতার নাম- সাদার দীন সাহেব। তিনি গুরুদাস পুর জেলার ভাম্বড়ি-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৯৪ইং সালে বয়আত করেন এবং একই বছর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, আমার শিক্ষকের নাম ছিল, মেহেরুল্লাহ্। তার কাছ থেকে আমি কুরআন শরীফ পাঠ করতে শিখি। তিনি বলতেন, খুব শীঘ্রই ইমাম মাহাদী আবির্ভূত হবেন আর তিনি আবির্ভূত হলে তাঁর হাতে বয়আত নিও। কাজেই যখন আমি শুনি, কাদিয়ানে ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়েছেন তখন আমি আমার সেই শিক্ষক মেহেরুল্লাহ্ সাহেবের কথা মত বয়আত নিই।

এরপর থেকে সর্বদাই আমি ভাম্বড়ি থেকে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম। হুযুর আকদাস (আ.) বলতেন, তোমাদের কাছে আমার বন্ধুরা আসলে তাদের আদর-যত্ন করো। মাস্টার আব্দুর রহমান ভাম্বড়ি সাহেব আমাদের এখানে যেতেন এবং মুফতি ফযলুর রহমান সাহেবও কখনো কখনো যেতেন। তিনি (রা.) বলেন, অনেক বার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে বলতে শুনেছি, আমাদের জামাত সত্য।

ইনশাআল্লাহ্, এর পতন ঘটবে না। মিথ্যা অল্প দিন থাকে কিন্তু সত্য সদা বিরাজমান। ভূ-স্বামী কতিপয় মেহমান কাদিয়ানে এসেছিলেন। তখন গ্রীষ্ম কাল ছিল। হুযুর (আ.) সকাল আটটার দিকে বাবুর্চীকে বললেন, তাদের জন্য কিছু খাবরের ব্যবস্থা কর। বাবুর্চী বলল, হুযুর রাতের বেচে যাওয়া কিছু বাসি রুটি আছে। হুযুর বললেন, কোন সমস্যা নেই নিয়ে আস। কাজেই বাসি রুটি আনা হল। হুযুর (আ.) এবং মেহমানগণ খেলেন। সম্ভবত সেই মেহমানরা তাদের গ্রাম আঠওয়াল ফিরে যচ্ছিলেন, এমন সময় হুযুর (আ.) বললেন, বাসি খাওয়া সুন্নত। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ১০৬)

গুজরাঁওয়ালার এক জনবসতি চাহরোডার আহাম্মদ পুর মহল্লার অধিবাসী মিয়া শরাফ উদ্দীন সাহেব দর্জির পুত্র হযরত মীরা বখ্‌শ সাহেব লিখেন, এ অধম সম্ভবতঃ ১৮৯৭ বা ১৮৯৮ইং সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত গ্রহণ করি। কিন্তু আমি আমার পিতার কাছে কিছু দিন পর্যন্ত এ কথাটি প্রকাশ করি নি। এ সব বিষয় কত দিন আর গোপন থাকে? শেষ পর্যন্ত বিষয়টি জানাজানি হলে আমার পিতা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আর আমিও রিয্‌কদাতা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আলাদা একটি দোকান ভাড়া নিই। হাত খাটো থাকলেও মনে খুব ইচ্ছা ছিল, যে করেই হোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পোষাক স্বহস্তে শেলাই করে উপহার দিব। এই মানসে আমি মসলিনের একটি কুর্তা, লেঠা কাপড়ের সেলওয়ার, কাল রং-এর কোর্ট এবং মসলিনের একটি পাগড়ী কিনে স্বহস্তে শেলাই করে পোশাক তৈরী করলাম। পরে এর-ওর কাছ থেকে কাদিয়ানের গাড়ি ভাড়া যোগাড় করে কাদিয়ানে পৌঁছলাম। পরের দিন ছিল জুমুআর দিন। তাই আশা করছিলাম, আজই যদি হুযূর (আ.)-কে এ নগন্য ও সাদামাটা উপহার সামগ্রী দিতে পারতাম তবে হুযূর হয়তো জুমুআর নামাযের পূর্বেই এগুলো পড়ে এ অধমকে খুশি করতেন।

এ কথা ভাবতে ভাবতেই কাজী জিয়া উদ্দীন সাহেবের দোকানে পৌঁছলাম এবং তাঁর কাছে মনের এই আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করলাম। এ কথা শোনা মাত্রই তিনি বললেন, চল মিয়া! আমি তোমাকে হুযুর (আ.) এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তখনই তিনি আমাকে হযরত আকদাস (আ.)এর কাছে নিয়ে গেলেন।

হুযূর (আ.) তখন চৌকিতে বসে কিছু একটা লিখছিলেন। আর খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব চৌকির পাশে চাটাইয়ের ওপর বসেছিলেন। আমরা দু'জনও গিয়ে খাজা সাহেবের পাশে বসে পড়লাম। খাজা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কি মনে করে আসলেন? কাজী সাহেব আমার আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে খাজা সাহেব আমাকে সম্বোধন করে বললেন, কোন সমস্যা নেই! আমি তোমার কাজ করে দিব। আমি বললাম, এটা তো আমার জন্য অনেক বড় অনুগ্রহ হবে। এ কথা শুনে খাজা সাহেব আমার কাছ থেকে কাপড় গুলো নিয়ে হুযূর (আ.)-কে দিলেন এবং বললেন, এ ছেলেটির আকাঙ্খা, আপনি যদি এ কাপড় পড়ে জুমুআর নামায পড়তেন! খাজা সাহেবের এ কথা শোনামাত্র হুযুর (আ.) কাপড় গুলো পরতে শুরু করলেন। (কাপড় পরার অর্থ তখনই দেখা শুরু করলেন) কোর্টটি পরার পর দেখা গেল এটি তাঁর গায়ে একটু আটোসাটো হয়। আমি বললাম, হুযূর! কোর্টটি খুব আটোসাটো, খুলে দিন আমি এটাকে খুলে কিছুটা বড় করে দিই। হুযূর (আ.) কোর্টটি খুলে আমাকে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি করে বাজারে এসে এক দর্জির দোকানে বসে কোর্টটির শেলাই খুলে কিছুটা বড় করে হুযূর (আ.) কে দিলাম। হুযূর (আ.) এটাকে পড়লেন কিন্তু তখনও এটার বোতামগুলো লাগানো যাচ্ছিল না। তবুও তিনি (আ.) টেনেটুনে এর বোতাম লাগালেন আর এটাও দেখলেন না যে, এ কাপড়টি হুযূরের জন্য মানানসই, নাকি না। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১২-১৪)

মৌলভী নেক আলম সাহেবের ছেলে হযরত মাস্টার খলীলুর রহমান সাহেব জম্মু কাশ্মীরের ছোম্বরের অধিবাসী ছিলেন, ১৯২৯ ইং সালে পেনশন লাভের পর তিনি কাদিয়ান চলে আসেন। তিনি লিখেন, ১৯০৭ ইং সালের সালানা জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন মসজিদে আকসায় প্রবেশ করলেন মসজিদ তখন লোকে লোকারণ্য, কোন জায়গা খালি ছিল না।

ডাঃ মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব হুযুর (আ.)-এর সাথে ছিলেন। জায়নামায তাঁর বগলে ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আদেশ দিলেন, লোকদের জুতা সরিয়ে এখানেই জায়নামায বিছিয়ে দাও। এর ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ডানে নামায পড়লেন ডাঃ ইয়াকুব বেগ সাহেব এবং বাম পাশে পড়লাম এই অধম লেখক। আলহামদুলিল্লাহ।

সে দিন আল্লাহ্‌র বাহাদুর পাহলোয়ান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তৃতা ছিল সবার শেষে। অর্থাৎ সে দিন কমপক্ষে পাঁচ ঘন্টা পর হুযূর (আ.) এর বক্তৃতা হয়েছিল। সেদিন আমি পূর্ববর্তী বক্তাদের কোন বক্তৃতাই শুনি নি। আমার দৃষ্টি ছিল শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র বীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রবিত্র ও কল্যাণময় চেহারার দিকে। আমি অঝরে কাঁদছিলাম। এখন মনে হচ্ছে,

হুযুর আনোয়ার (আ.)-কে আমি পরবর্তীতে আর কখনো দেখতে পাবো না, এজন্যই হয়তো এ অধম সেদিন পাঁচ ঘন্টা যাবৎ হুযূর (আ.)এর বরকতময় চেহারা একাগ্রচিত্তে দেখছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, কারো বক্তৃতার কোন অংশই আমার মনে নেই। এ সময়ে আমি তাঁর ভালবাসার আবেগে খুব করে কেঁদে ছিলাম। আহামদুলিল্লাহ। হুযূর (আ.) তাঁর বক্তৃতার সময় স্টেজে গিয়ে সূরা ফাতিহার সূক্ষ্ম, হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী তফসীর বর্ণনা করলেন।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ১২৫-১৩৬)

[মাঝে হুযূর (আই.) বলেন, অনেক আগেই বের হয়েছিলাম কিন্তু তুষারপাতের কারণে আজ রাস্তায় খুব জ্যাম থাকায় দেরী হয়েছে। জুমুআর নামায শুরু হওয়ার পর এখন রোদ উঠেছে। আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের পূর্ণ সময় না নিলেও কিছুটা বেশি সময় অবশ্যই নিব।]

শিয়ালকোট জেলার চাংরিয়া তাহসিলের অধিবাসী হযরত গোলাম রসূল সাহেব (রা.) লিখেন, আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপা ও দয়ায় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। এ অধম ১৯০১ইং বা ১৯০২ইং সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করি। তখন আমি এক সপ্তাহ হুযুর (আ.)-এর সেবায় অবস্থান করি। সাধারণত মাগরিবের নামাযের পর তিনি যখন মসজিদে বসতেন তখন আমরা (তাঁর হাত-পা) টিপে দিতাম।

তিনি (আ.) আমাদেরকে নিষেধ করতেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে মৌলভীরা যে সন্দেহের জাল বুনতো তাঁর কল্যাণময় মুখমন্ডল দেখলে তা দূর হয়ে যেত। আমি শুনেছিলাম, প্রতিশ্রুত মাহদীর মুখমন্ডল তারকারাজির মত উজ্জ্বল হবে আর আমি তাঁকে এমনই পেয়েছি। তাঁর মুখমন্ডল দেখেই আমার সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে করম দীন যখন ম্যাজিস্ট্রেট চান্দু লালার আদালতে মামলা করল তখন (এমন কথা) আলোড়িত হচ্ছিল যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অবশ্যই কারাভোগ করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, মানুষ বলে বেড়াচ্ছে, আমি জেলে যাব কিন্তু আমার আল্লাহ্ বলেছেন, আমি তোমাকে বদরের যুদ্ধের সাহাবাদের মত বিজয় দান করব। হুযুর (আ.) এর এ কথাগুলো এখনো আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১১১)

সিন্দ প্রদেশের আহমদী হযরত রহমত উল্লাহ্ আহমদী সাহেব লিখেন, আমার নাম রহমত উল্লাহ্। আমার পিতা ছিলেন লুধিয়ানা জেলার বেরমী মৌজার অধিবাসী মৌলভী মুহাম্মদ আমীর শাহ্ কুরাইশী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে আমাকে বেছে নিয়েছেন। নয়তো আমার এতোবড় সৌভাগ্য! এর ব্যাখ্যা হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কয়েক মাস লুধিয়ানাতে অবস্থান করেছিলেন, তখন আমার ছাত্র জীবন, বয়স প্রায় ১৭-১৮ বছর। বিভিন্ন সময় আমি হুযূর (আ.)-এর কাছে যেতাম।

হুযূর (আ.)-এর বরকতময় মুখমন্ডলের উজ্জল নূর আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। যার জন্য আমার মন আমাকে বাধ্য করেছে, এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। কিন্তু আশেপাশের মৌলভীরা আমাকে সন্দেহে নিপতিত করত। এমন সময় লুধিয়ানায় মৌলভী মুহাম্মদ বাটালভী ও হুযূর (আ.) এর মধ্যে একটি ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আমার হেদায়াতের জন্য দুই খন্ডের বই 'ইযালায়ে আওহাম'-এর ব্যবস্থা করে দেন।

এটি ছিল হেদায়াত ও নূরে একদম পরিপূর্ণ একটি বই। আল্লাহ্ জানেন, তখন অধিকাংশ সময় আমি সারা রাত ঘুমাতাম না। বই-এর উপর মাথা রেখে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে সেটা আলাদা কথা, অন্যথায় আমি শুধু পড়ছিলাম এবং এ কথা ভেবে কাঁদছিলাম যে, হে খোদা! এটা কেমন বিষয়- মৌলভীরা কুরআন শরীফ পরিত্যাগ করছে কেন? আল্লাহ্ তাআলা জানেন, আমার মনের মাঝে (সত্যের প্রতি) ভালবাসার আগুন উদ্দীপ্ত হচ্ছিল। মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গোভী সাহেবকে আমি চিঠি লিখলাম, হযরত মির্যা সাহেব ৩০টি আয়াত দ্বারা ঈসা (আ.)এর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন। ঈসার জীবিত থাকা সম্পর্কে যে সব আয়াত ও হাদীস রয়েছে সেগুলো এবং মির্যা সাহেব কর্তৃক উপস্থাপিত আয়াত ত্রিশটি খন্ডন করে অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমাকে লিখে পাঠান, আমি সেগুলো ছাপিয়ে দিব। উত্তর এলো, ঈসা (আ.) এর জীবন বা মৃত্যু প্রসঙ্গে আপনি মির্যা সাহেব বা তাঁর কোন শিষ্যের সাথে আলোচনা করবেন না।

কেননা অধিকাংশ আয়াতে মৃত্যুর বিষয়টি পাওয়া যায়। (কুরআন করীম দেখলে তো মৃত্যুর আয়াতই পাওয়া যাবে।) সেই অ-আহমদী মৌলভীরা লিখল, এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বরং মির্যা সাহেব কি করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হলেন- এ বিষয়ে বির্তক করুন। আমি উত্তরে লিখলাম, হযরত ঈসা মারা গেলে তো মির্যা সাহেব সত্যবাদী সাব্যস্ত হন। এর উত্তর এলো, আপনার ঘাড়ে মির্যা সাহেবের ভূত চেপেছে। আমি দোয়া করবো। এর উত্তরে আমি লিখলাম, আপনি আপনার নিজের জন্য দোয়া করুন। শেষ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এমন বিগলিত চিত্তে সমর্পিত হলাম, যেন আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠল।

প্রার্থণা করলাম, হে আমার খোদ! তোমার সন্তুষ্টি প্রয়োজন। আমি তোমার জন্য সব ধরণের সম্মান বিসর্জন দিতে এবং সব ধরণের লাঞ্ছনা বরণ করতে প্রস্তুত আছি। তুমি আমার উপর দয়া কর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৯৩ ইং সালের ২৫ ডিসেম্বর রোজ সোমবার আমি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর সাক্ষাত লাভ করলাম। এ স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ হল, অধম আসর নামাযের জন্য ওজু করছিলাম।

এমন সময় কেউ আমাকে সংবাদ দিল, রাসূল করীম (সা.) এসেছেন এবং এ দেশেই থাকবেন। আমি বললাম, কোথায়? সে বলল, এ তাবুগুলো হুযূর (সা.) এর। আমি তাড়াতাড়ি নামায পড়ে সেখানে গেলাম। হুযূর (সা.) কিছু সাহাবার মাঝে বসা ছিলেন। সালাম বিনিময়ের পর আমাকে করমর্দনের সুযোগ দিলেন। আমি আদবের সাথে বসে পড়লাম। নবী করীম (সা.) আরবী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন আর আমি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী অনুধাবন করছিলাম। এরপর তিনি উর্দূ বলছিলেন, আমি সত্যবাদী, আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত

করো না ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি (রা.) লিখেন, আমি বললাম,

امنا و صدقنا يا رسول الله

সমস্ত গ্রামটি মুসলমান ছিল। আমি ভাবলাম, হে আমার খোদ! এ কি অবস্থা? আজ মুসলমানদের আত্মত্যাগের দিন, এটা যেন হুযুরের প্রাথমিক যুগ ছিল। যদিও আমাকে জানানো হয়েছিল, নবী করীম (সা) এ দেশেই থাকবেন কিন্তু তিনি (সা.) রওয়ানা দেয়ার ঘোষণা দিলেন।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, হুযুর আপনি চলে গেলে আপনার সাথে আমি কিভাবে সাক্ষাত করবো? নবী করীম (সা.) আমার কাঁধে তাঁর বরকতময় হাত রেখে বললেন, ভয়ের কিছু নেই আমি নিজেই তোমার সাথে সাক্ষাত করবো। এ থেকে আমি বুঝলাম, কার্যত আমাকে বুঝানো হল, হযরত মির্যা সাহেবই রসূলে আরবী। আমি বয়আতের চিঠি লিখে পাঠালাম। এরপরই ১৮৯৮ইং সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখ মাগরিবের নামাযের পর কাদিয়ান উপস্থিত হয়ে বয়আত করা সুযোগ হয়।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাকে এমন দৃঢ়তা দান করেছে যে, কোন সমস্যাই আমাকে পিছ পা করতে পারে নি। আসলে এটা হুযূর (আ.) এর সাথে বার বার সাক্ষাতের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমার এ হাত হুযুরের শরীর টিপে দেয়ার মর্যাদাও লাভ করেছে। বয়আতের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মূখী হতে হয় কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কেবল রক্ষাই করেন নি বরং ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি পুরস্কৃত করেছেন। আমার পিতা, ভাই ও অন্যান্য নিকট আত্মিয়রা আহমদী হয়ে যান। আহামদুলিল্লাহ।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ;৫৮-৫৯)

ঝেলাম জেলার দুলমিয়ালের অধিবাসী হযরত মৌলভী ফাতেহ্ আলী আহমদী সাহেব মুন্সি ফাযেল বলেন, ১৯০৪ইং সালে আমি সপরিবারে এসে হুযূরের হাতে বয়আত করি।

হুযুর (আ.) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন প্রতি বছর তাঁর খেদমতে সপরিবারে উপস্থিত হতাম। যখনই হুযুর (আ.) নামাযের জন্য বাহিরে আসতেন এবং মসজিদে বসতেন তখন দুলমিয়াল জামা'তের আমরা পাঁচ-সাত জন তাঁর পাশে বসতাম।

হুযূরের কথা হতে কল্যাণ মন্ডিত হতাম এবং কয়েক বার দোয়ার আবেদনও করেছি। তখন এ মসজিদটি ছোট ছিল, খুব কষ্টে-সৃষ্টে পাঁচ ছয় জন দাড়ানো যেত। পরবর্তীতে মসজিদে মুবারক প্রশস্ত করা হয়।

একবার আমাদের জামাতের মসজিদের ইমাম মৌলভী কারম দাদ সাহেব বলেন, অনেক দিন পূর্ব থেকে আমাদের মসজিদের ইমাম সৈয়দ জাফর শাহ্ সাহেব আপনার প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি আপনার মান্যকারী কিন্তু বিভিন্ন সময় অ-আহমদীদের জানাযা ও নামাযে ইকতেদা করেন। (মানেন কিন্তু অ-আহমদী মৌলভীর পিছনে নামায পড়েন।) আমি বললাম, এ ব্যক্তি আপনার প্রতি এতটুকু বিশ্বাস রাখে যে, একবার আমাকে দিয়ে এটি চিঠি লিখিয়েছিলেন, আর তিনি এতে লিখান- আমি হুযুরের কুকুরেরও দাস। অজ্ঞতা বশত কখনো যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিবেন।

এ কথার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সে যখন এখনো জাগতিক ভোগবিলাশের লালসায় বা এগুলো হারানোর ভয়ে অ-আহমদীদের পিছনে নামায বা জানাযা (অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে কাফের বলে তাদের পিছনে নামায) পড়ে তখন সে আমাকে কিভাবে মান্য করল? আপনারা তার পিছনে নামায পড়বেন না। (লেখক একজন দর্জি ছিলেন) তিনি বলেন, তখন আমি হযরত উম্মুল মুমিনীনের আদেশে ভিতর বাড়িতে শেলাই মেশিন আনিয়ে হযরত সাহেবজাদা শরীফ আহমদ (রা.) এর জন্য গরম কোর্ট বানাচ্ছিলাম, তাঁর বয়স তখন ৮/১০ বছর ছিল।

তিনি বলেন, আমরা দুলমিয়াল খেওড়া থেকে আসতাম। আমাদের মহিলারা বলতো পাহাড়ের মধ্যে আমাদের ১০-১১ মাইল পথ পায়ে হেটে আসতে হয় এজন্য আমরা বিছানা আনতে পারি না। এ কথা শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, হামিদ আলী! (হামিদ আলী সাহেব তাঁর খাদেম ছিল) দুলমিয়াল থেকে যারা এসেছে তাদের লেপ ও বিছানা পত্রের ব্যবস্থা করে দিন।

তিনি হুযূর (আ.) এর সহনশীলতা সম্পর্কে একটি ঘটনা বলেন, কারো কোন অসুখ বিসুখ হলে ঔষধ-পত্রও আমরা হুযূর (আ.) এর কাছ থেকেই নিতাম। তিনি বলেন, একবার আমার ছেলে মরহুম আব্দুল আযীয আমার সাথে এলো, তখন তার বয়স ছিল ৮ বছর। সে হুযুরের দুররে সামিনের পংক্তিগুলো সুললিত কণ্ঠে ও উচ্চ স্বরে পাঠ করত। সে জলসায় এবং হুযুরের কাছে এসেও এগুলো পড়ে শোনাত। হুযূর (আ.) তাকে খুব স্নেহ করতেন। এ ছেলেই দুলমিয়ালবাসীর আবেদন ভেতর বাড়ি পৌঁছে দিত।

একবার নেয়ামতের পুত্র মুহাম্মদ আলী বিশেষ একটি দোয়ার আবেদন লিখে হুযূর (আ.) কে দেয়ার জন্য আব্দুল আযীযের কাছে দেয় এবং বাড়ি যাওয়ার অনুমতি আনতে বলে। তখনও ভোর, তাই হুযূর ফযর নামাযের পর লেপ মুরি দিয়ে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে শুয়েছিলেন। এও বাচ্চা ছিল তাই আদব কায়দার বিষয়টি তেমন বুঝত না যে, হুযূর (আ.) আরাম করছেন। (অনেক সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফযর নামাযের পর আরাম করতেন) এই বাচ্চা বাড়ির ভিতর গিয়ে হুযূর (আ.) এর মুখের উপর থেকে লেপ সরিয়ে চিরকুট দিয়ে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চায়।

তিনি লিখেন, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন, এতে হুযূর (আ.) এর চেহারায় বিন্দুমাত্র বিরক্তির ছাপও পড়ল না যে, হে বেয়াদব! আমার আরাম নষ্ট করে দিয়েছো। বরং তিনি স্নেহের সুরে বললেন, ঠিক আছে যাও। এই হল তাঁর উন্নত চরিত্রের পরিচয় যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তার প্রেমিক বানিয়েছেন। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ৭২-৭৩)

আম্বালার শের মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র হযরত বাহওয়াল শাহ্ লিখেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মসীহ্ ও মাহদীর সাথে এ অধমকে কিভাবে সাক্ষাত করিয়েছেন এবং সাক্ষাতের ফলে কী লাভ হয়েছে এ সম্পর্কে আমি সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে হাজির নাযির জেনে বলছি

যাঁর সম্মূখে মিথ্যা বলা কুফর ও পথভ্রষ্টতা এবং জাহান্নামী হওয়ার শামিল। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় ছোটবেলা থেকেই আমার ধর্মের প্রতি আন্তরিকতা ছিল। প্রায় ৩০ বছর বয়সে নবী করীম (সা.) এর একটি সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে এবং এতে কিছুটা বক্রতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য ৩ বছর পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা ছিল যাতে দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা ছিল না। আমর চেয়ে গ্রামবাসীর কষ্ট ছিল বেশি। কেননা তারাই ছিল বক্রতার কারণ। বাল্যকাল থেকেই আমার মনে কোন সত্য পথ প্রদর্শকের আকাঙ্খা ছিল।

অনেক বুযুর্গের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল কিন্তু হৃদয়ে প্রশান্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত চক লোহাটীর মিয়াঁজী ইমাম উদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীর বিষয়ে জানতে পারি। ইনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং মৌলভী আব্দুল হক সাহেব যিনি তখনও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে মান্য করেন নি, আমার পর তিনি আহমদী হয়ে মারা গেছেন, তার পিতা ছিলেন। তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। আল্লাহ্ তার উপর দয়া করুন। তিনি বলতেন, এ যুগ এক যুগ-ইমামের প্রত্যাশী এবং প্রকৃত পক্ষে মির্যা সাহেব সত্য ইমাম। মানুষ তাকে মন্দ বলে।

তিনি আমাকে ও মৌলভী আব্দুল হক সাহেবকে সম্বোধন করে বলতেন, দেখো! তোমরা কখনো তাঁকে মন্দ বলবে না। মৌলভ মুহাম্মদ হোসেন যখন দিল্লীতে মৌলভী নাযির হোসেনের কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপর কুফরী ফতোয়া দেয়ার জন্য এসেছিল তখন আমি ও মৌলভী আব্দুল হক সাহেব মৌলভী নাযীর হোসেনের কাছে পড়াশোনার জন্য দিল্লীতেই ছিলাম। ছয়-সাত মাস পর আমি চক লোওহাটে আমার শিক্ষকের কাছে ফিরে আসি কিন্তু মৌলভী আব্দুল হক সাহেব দিল্লীতেই পড়তে থাকেন।

মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন দিল্লী থেকে ফিরে আমাদের গ্রামের আশেপাশে মানুষদের দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে কাফের বলানোর জন্য ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে শুরু করে। মিয়াঁজী ইমাম উদ্দীন সাহেবের কাছেও এসেছে কিন্তু কখনো তিনি বাজে মন্তব্য করেন নি। তিনি বললেন, আপনি কুফরের যে প্রাসাদ নির্মান করেছেন সেখানে আমার ইট লাগানোর সুযোগ কোথায়? আপনি আলেম, আপনার মুবারক হোক। পরিশেষে মুহাম্মদ হোসেন নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

মামলা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করায় হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানোয়ারী সাহেব ও মৌলভী আব্দুল হক সাহেব আমাকে দোয়া করানোর জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাছে পাঠালেন। বাটালা থেকে রওয়ানা দিয়ে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা শুরু করলাম; যার সাথেই সাক্ষাত হচ্ছিল সে বলছিল, সেখানে যেও না। তিনি এমন, তিনি ওমন ইত্যাদি ইত্যাদি। মৌলভীরা তাকে মন্দ বলে, তুমিও মন্দ অর্থাৎ কাফের হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি তাদের বললাম, এখন তো এসে গেছি আল্লাহ্ যা করে; তিনি সত্য হলে আল্লাহ্‌র ফযলে মৌলভীদের আমি ভয় পাই না। ১৮৯৮ইং সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে আমি দারুল আমান-এ পৌঁছালাম। সেদিন দিনের আলো ফুরোতে অল্প সময় বাকী ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকের উপর ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব (রা.), মুফতী সাদেক সাহেব (রা.) এবং আরো কয়েক জন সাহাবী হুযুরের সাথে ছিলেন। মরহুম মৌলভী আব্দুল কাদের লুধিয়ানী মসজিদে মুবারকের উপরে সিড়ির কাছে দাড়িয়ে ছিলেন। ইনি মৌলভী আব্দুল হক সাহেবের আরবী গ্রামার শিক্ষক ছিলেন এবং আমাকেও চিনতেন। তিনি খুব আনন্দ ও আগ্রহের সাথে আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হলেন।

তিনি বললেন, তুমি বয়আত করতে এসেছো? আমি বললাম, দোয়া করানোর জন্য এসেছি। আবার বললেন, মৌলভীদের ভয় পাও? আমি বললাম, না, আমি তো মৌলভীদের ভয় পাই না। হুযুরের পবিত্র মুখশ্রী দেখার পরই আমার কাছে হযরত মসী?হ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। কেননা এমন চেহারার লোক মিথ্যাবাদী হতে পারে না। সূর্যাস্তের সময় হয়ে এলো। হুযুর (আ.) এর কাছে আরেক ব্যক্তি বয়আত নেয়ার জন্য বেশ কয়েক দিন যাবৎ এসেছিল। তিনি বললেন, হুযুর আপনি আমার বয়আত নিন, আমি বাড়ি ফিরে যাব। হুযূর (আ.) বললেন, থাক, খুব ভাল ভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। এরপর তিনি অন্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব নিজে হুযুরের কাছে আমার বিষয়ে বললেন, এ ব্যক্তি বয়আত করতে চায়।

হুযূর (আ.) একটু উচু স্থানে বসে ছিলেন, এ কথা শোনা মাত্র নিচে বসলেন এবং বললেন, যারা বয়আত করতে চাও চলে আস। যিনি প্রথম বয়আত করতে চেয়েছিলেন সে ব্যক্তি তো আগে থেকেই হুযুরের কাছে বসা ছিল। আমি সিড়ি থেকে এগিয়ে হুযুর (আ.) এর দিকে এগুলাম যখন দু-তিন হাত দুরত্বে পৌছলাম তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন আকর্ষন সৃষ্টি হল যেন কেউ আমাকে রশি দিয়ে তার দিকে টেনে নিচ্ছে। আমার হৃদয় বিগলিত হল এবং আমি গিয়ে হুযূরের পাশে বসলাম। আনন্দের সাথে আমরা দু'জন বয়আত করলাম এবং পরে হুযুরের কাছে মামলার বিষয়ে দোয়ার জন্য আবেদন করি। হুযুর (আ.) দোয়া করলেন।

এরপর আমি সেখানে দশ দিন থাকলাম। তিনি বলেন, হুযূর ও কাদিয়ানের সাথে এমন ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল যে, বাড়ি ফিরে যেতে মন চাচ্ছিল না। কাদিয়ানকে একদম বেহেস্তের মত মনে হচ্ছিল। এখানে সারা দিন আল্লাহ্ তাআলার যিকর ছাড়া জাগতিক চিন্তা-ভাবনার আওয়াজও শোনা যেত না। সব দিক থেকে সালামের আওয়াজ ধ্বনিত হতো।

আমার সব দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে গেল। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলা চলছিল বা করা হয়েছিল। অতঃপর আমি অনুমতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তিনি বলেন, কিন্তু বয়আত করার পর আমার অবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র সাথে এতো গভীর প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি হল যে, রাত-দিন তাঁর যিক্‌র ছাড়া ঘুমাতেও মন চায় না। ঘুমালেও ভয়ে ভীত হয়ে উঠে পরতাম, যেন কোন প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদ হতে

পৃথক হচ্ছে। আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা বিরজ করছিল। বার বার এমন মনে হতো, কেউ যেন আমার হৃদপিন্ড হাতে ধরে ধুয়ে দিচ্ছে। দিন দিন নামাযের মাঝে হৃদয় বিগলিত হচ্ছিল। এটা ছিল হুযূর (আ.) এর দৃষ্টির প্রভাব।

একদিন আমার মনের অবস্থা এমন হল, যেন আমার হৃদপিন্ড বিদীর্ণ হয়েছে এবং একে দোয়া করে ধৌত করা হয়েছে। আর এতে একটি নতুন আত্মা প্রবিষ্ট হয়েছে। যাকে রূহুল কুদুস বলা হয়। আমার অবস্থা গর্ভবতী নারীর মতো হল। আমার পেটের মাঝে বাচ্চার মত মনে হতো। আমার অস্তিত্ব পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হল এবং আলোকিত হল এবং মনে হতো বুকের মাঝে নূর দৌড়াচ্ছে। যিক্‌র করার সময় জিহ্বায় এমন সুখকর অনুভূতি সৃষ্টি হতো যা অন্য কিছুর মাঝে নেই।

আমার পিছনে যারা নামায পড়ত তারাও নামাযে খুব তৃপ্তি পাচ্ছিল। তারা আনন্দিত হয়ে বলতো কেমন সুন্দর নামায পড়িয়েছ। এটা আসলে আমার অবস্থা ছিল না বরং এটি ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অবস্থার প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ায় আমি দারুল আমানে থাকা অবস্থাতেই মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা একে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাছে পৌছার মাধ্যম বানিয়ে ছিলেন যার মাধ্যমে তাঁর অধম বান্দাকে আকাশে পরিভ্রমণ করিয়েছেন এবং তাঁর সাক্ষাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

মসজিদের মধ্যে আমি একা একা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও বিরোধীদের বই নিয়ে বসতাম ও গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করতাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুক্তি প্রমাণগুলো কুরআন শরীফের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেতাম।

একদিন আমি এক বিরোধীর বই দেখছিলাম এবং এ কথা ভেবে মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিলাম, এরা কেমন আলেম যারা এমন বই রচনা করে। এমনটি ভাবতেই ঘুম এলো, আমি ঘুমিয়ে পরলাম এবং ইলহাম হল, بل عجبوا ان جاء هم قوم منذر অর্থাৎ বরং তারা এই ভেবে আশ্চর্য হয় যে, তাদের কাছে এক সর্তককারী জাতি এসেছে।

এ ইলহামটি আমার মনের মাঝে এমন ভারে উন্মেষ ঘটালো যে, গলনালী দিয়ে কোন জিনিস যেন প্রবেশ করেছে। মনে হওয়ার সাথে সাথেই আমি বলতে শুরু করলাম। এ ইলহামের এই অর্থ করা হয়েছে যে, এ আলেমরা এমন জাতি যখন এদের কাছে সর্তককারী অর্থাৎ নবী এসেছেন তখন তারা (এ সব মৌলভীরা) আশ্চর্য হয়। আমি আমার ইলহাম ও স্বপ্নসমূহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাছে লিখতাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর যখন কেউ কোন আপত্তি করত এর উত্তর দেয়ার জন্য তখনই আমার মনে কুরআন শরীফের আয়াত ভেসে উঠতো।

আমি কুরআন শরীফ থেকে এর উত্তর দিতাম। একবার এক মৌলভী আমার কাছে এসে বলল, কুরআন শরীফ থেকে হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু প্রমাণ করুন। এমন আয়াত দেখান যেখানে মৃত্যু শব্দ এসেছে। আমি বললাম দেখো আল্লাহ্ তাআলা বলছেন,

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

অর্থাৎ আহলে কিতাবের যে কেউ এখন কুরআন করীমের এ সিদ্ধান্ত পড়ার পর যে, হযরত ঈসা (আ.) শুলবিদ্ধ হয়ে বা হত্যার মাধ্যমে মারা যান নি বরং স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন- এর উপর ঈমান আনবে না। (সূরা আন্ নিসা, ১৬০)

অর্থাৎ তারা এমন কথার উপর ঈমান আনবে যে, তিনি শুলবিদ্ধ বা হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করেন নি।

- এরই প্রতি ইঙ্গিত করছে এবং তার অর্থ ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু।

হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের দিন এ সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি শূলবিদ্ধ বা হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করি নি বরং আমি কুরআন শরীফের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছি। এ কথা শোনা মাত্রই সেই মৌলভী চলে যায়। এ জন্য সেই গ্রামের অধিকাংশ লোক আহমদী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মৌলভীদের প্ররোচনা ও ভীতি প্রদর্শনের দরূন কিছু লোক মুর্তাদ হয়ে যায়। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ১০৭-১১২)

হযরত মদদ খান সাহেব (রা.) কাদিয়ানের বায়তুল মাল ইন্সপেক্টার ছিলেন। তিনি কাশমীরের অধিবাসী এবং ১৮৯৬ইং সালে বয়আত করে ১৯০৪ইং সালে হুযুরের সাথে সাক্ষাত করেন।

তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় খোদা! আমি তোমার পবিত্র নবী সম্পর্কে লিখতে যাচ্ছি কাজেই তুমি এতে বরকত দান কর। এতে যেন মনগড়া কোন কথা লিখা না হয়।

তিনি লিখেন, ১৯০৪ইং সালে গুরুদাস পুর চান্দু লালের আদালতে করম দীনের মামলা ছিল। খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব ছিলেন হুযূর (আ.) এর পক্ষের উকিল এবং করম দীনের উকিল ছিল, মোল রাজ ও নবী বাখ্‌শ।

এ অধম, সৈয়্যদ আহমদ নূর সাহেব এবং হাফেজ হামিদ আলী সাহেব একবার কাদিয়ান থেকে গাড়িতে করে বই নিয়ে গুরুদাস পুর পৌছলাম। সেখানে ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব গুড়ীয়ানি ওয়ালেকে খুব অস্থির দেখলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তার সাহেব আপনাকে এমন ভীত শন্ত্রস্থ দেখাচ্ছে কেন? তিনি বললেন, ভাই সাহেব! আমার ভীতির কারণ, আমি শুনেছি এখানে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, হুযূর (আ.) কে তারা পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও কারাবন্দি করবে। চান্দু লাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে।

একজন বড় অফিসার এ খবর দিয়েছেন। আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম, এখন আপনি কি করতে চান? বা কি করা উচিত? ডাক্তার সাহেব বললেন, একটা ভাল কাজ

করুন। হুযূর (আ.) কে এ বার্তা পৌছে দিন যে, তিনি যেন গুরুদাসপুর না আসেন এবং একটি অসুস্থতার সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন যদি একশত টাকাও খরচ হয় সমস্যা নেই, আমি নিজে এর ব্যয়ভার বহন করব। ডাক্তার সাহেবকে বললাম, হুযুর কি মিথ্যা সার্টিফিকেট নিবেন?

ডাক্তার সাহেব বললেন ভাই সাহেব! কেউ যদি নেকী করতে চায় তো করুক। আমি বললাম, তবে কি এখনই কেউ রওয়ানা দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমাকে একটি হারিকেনের ব্যবস্থা করে দিন, আমি রাতেই চলে যাব। ডাক্তার সাহেব তখনই একটি হারিকেন দিলেন।

আমি গুরুদাসপুর থেকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে শেখ হামিদ আলী সাহেব এবং মুন্সি আব্দুল গনী সাহেবের সাথে সাক্ষাত হল। রাত ২টার সময় আমরা মসজিদে মুবারক পৌছলাম। আমাদের খবর পেয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাইরে এলেন। আমি আসসালামুআলাইকুম-এর পর বললাম, ডাক্তার ইসমাঈল সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ। তিনি আমাকে এ সংবাদ দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। এ কথা শুনে হুযুর (আ.) বললেন, আমার তো আগে থেকেই মাথা ঘুরার সমস্যা আছে আর সার্টিফিকেট নেয়ার কথাও ভেবে ছিলাম। কিন্তু এখন তো আমি গুরুদাস পুর গিয়ে-ই সার্টিফিকেট নিব। আর এটা কোন ভয়ের কথা নয়। তিনি (আ.) আমার জন্য বাড়ির ভিতর থেকে লেপ পাঠালেন, আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম তাই ঘুমিয়ে পরলাম। আর ওনিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গুরুদাসপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

তিনি (রা.) বলেন, লোকেরা আমাকে যেতে মানা করল এবং বলল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রওয়ানা হয়ে গেছেন, আর হয়তো পৌছেও গেছেন। কিন্তু আমি ঘুম থেকে জেগে তৈরী হয়ে হেটেই রওয়ানা দিলাম। যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলে ছিলেন, ও যেন পায়ে হেটে না আসে, তাকে টাঙ্গা গাড়িতে পাঠিও। পথে আমার অবস্থা খুব সঙ্গিন হল এবং গায়ে জ্বর এলো। হুযুর (আ.) যে বাসায় উঠে ছিলেন সন্ধ্যায় আমি সেখানে পৌছলাম। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই শুনলাম, হুযূর বলছেন, মদদ খানকে কি এক্কায় উঠিয়ে এনেছ, নাকি না? এ কথা শোনার পর মনে হল, ঘুমন্ত মানুষের জাগ্রত হওয়ার ন্যায় আমিও জেগে উঠলাম। আঙ্গিনায় পৌছার পর কোন এক বন্ধু বললেন, হুযুর মদদ খান এসেছে।

আমি গিয়ে হুযূরকে আসসালামুআলাইকুম বললাম। হুযুর আমার দিকে তাঁর পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমার হাত ধরে বললেন, যাযাকাল্লাহ, এ ব্যক্তি খুব সাহসী, সে তিনবার যাতায়াত করেছে। হুযুর আমার হাত ততক্ষণ ধরে রাখলেন যতক্ষণ না আমি এমন অনুভব করলাম যেন গুরুদাসপুর থেকে কাদিয়ান যাই-ই নি।

ঘুম ও ক্লান্তির কারণে আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, কারো সাথে কথা বলতেও মন চাচ্ছিল না এবং শরীরে জ্বর ছিল। কিন্তু আমার সমস্ত ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়েছে এমন অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাসূল এ অধমের হাত ছাড়েন নি। কয়েক মিনিট পূর্বেও আমি নিস্প্রভ ছিলাম আর হুযুরের পবিত্র হাতের সাথে আমার হাত লাগতেই আমার ব্যথা ও ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, শরীর ফুরফুরে হয়ে গেল এবং আর কষ্টের কিছুই বাকী থাকল না।

এটা তো হুযুরের কোন কেরামত। তখন আমার মনে হল, ক্ষুধা ও পিপাসা সুসংবাদ পেলে দূর হতে পারে এটা মেনে নিলাম কিন্তু যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও ঘুম হুযূরের পবিত্র হাতের সংস্পর্শেই দূর হয়েছে। এটা হুযূরের কেরামত না হলে আর কী? ইতিপূর্বে আমার শরীর পাথরের মত ভার হয়ে গিয়েছিল। নড়াচড়া করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমার মনে হল, একেই বলে মৃতকে জীবিত করা। মনে হচ্ছিল আমি কখনো গুরুদাসপুর যাই-ই নি। হুযুর (আ.) খাবার আনার আদেশ দিলেন। এ অধমকেও তাঁর সাথে বসালেন। আমি হুযুরের সাথে খাবার খেলাম। আমার প্রতি এটা হুযুরের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ছিল।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ৮২-৮৭)

এই ছিল সেই সব বুযুর্গদের ঘটনা যা আমি ইতিপূর্বেও দু'একবার শুনিয়েছি। বিভিন্ন সময় এগুলো বর্ণনা করার কারণ, বিশেষ করে যেন সে সব পরিবারের কথা মনে থাকে যেগুলোতে এমন বুযুর্গ রয়েছেন, আমাদের প্রতি যাঁদের অনেক অনুগ্রহ। অন্যথায় হয়ত-বা সত্যকে মানার এরূপ সাহস অনেকের মাঝেই হতো না, যেরূপ সাহসিকতা এ সব বুযুর্গ প্রদর্শন করেছেন। কাজেই এ সব বুযুর্গের বংশধরদের উচিত তারা যেন তাদের বুযুর্গদের জন্য অনেক দোয়া করে। আর নিজেদের ঈমানের উন্নতি ও দৃঢ়তার জন্যেও দোয়া করা উচিত। এছাড়াও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে তাঁদের যে সম্পর্ক ছিল সেটাকে দৃষ্টিপটে রেখে সেই আদর্শ অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এদের কেউ কেউ এমন লোকও ছিলেন যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম ছিল কিন্তু তাদের মাঝে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার তৃষ্ণা মিটানোর এক ধরণের ব্যকুলতা ছিল।

তারা সেই তৃষ্ণা মিটিয়েছেন এবং প্রকৃত প্রেমিক সাব্যস্ত হয়েছেন। ফলে তাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন যা আমি কিছুক্ষণ পূর্বেই শুনালাম। অতএব এই হল সেই বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার উপমা যা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও আন্তরিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

অনুবাদ ঃ
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।